পরিমার্জিত সংস্করণ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
ইমাম গাযালী রহ. এর

খোলা চিঠি

আবদুল্লাহ আল ফারুক
[অনূদিত]

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ইমাম গাযালী রহ.-এর

খোলা চিঠি

ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মাদ গাযালী রহ.

[ইন্তিকাল ৫০৫ হিজরী]

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আযহার

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ইমাম গাযালী রহ.-এর খোলা চিঠি

মূল : ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মাদ গাযালী রহ.

অনুবাদ : আবদুল্লাহ্ আল ফারুক

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

বর্ণবিন্যাস : মদীনা মাল্টিমিডিয়া 01911 525 070

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত। দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত। মুহাম্মদ আল লিটন কর্তৃক প্রগতি প্রিন্টিং প্যালেস, কাঠালবাগান থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশকাল : কিতাবমেলা ২০১৭ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

মূল্য : ৬০/- টাকা মাত্র

উ|ৎ|স|র্গ

প্রিয় নন্দিনী

নুসাইবা উম্মে উমারা

তোমার খুদে হাতের আলতো পরশ
মুছে দেয় পোড়া চোখের তপ্ত আঁসু।

বইটির পটভূমি

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্যে, যিনি উভয় জাহানের **প্রতিপালক।** খোদাভীরুদের ভাগ্যেই রয়েছে সুন্দর পরিণতি। দরুদ ও **সালাম বর্ষিত** হোক তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া**সাল্লাম ও তাঁর** পরিবার-পরিজনের ওপর।

ঘটনা হলো— হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ **মুহাম্মাদ ইবনে** মুহাম্মাদ গাযালী রহ.-এর খুব কাছের এক শিষ্য দীর্ঘদিন **একনিবিষ্ট মনে** তাঁর খেদমত করে। এ সময় সে তাঁর কাছে বেশকিছু **শাস্ত্রের কিতাবাদি** অধ্যয়ন করে। সে নিমগ্ন মনেই শিক্ষার্জন করে। এভাবে সে **অনেকগুলো** সূক্ষ্ম শাস্ত্রের ওপর গভীর বুৎপত্তি লাভ করে

একদিন সে নিজের ব্যক্তিজীবনের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ **করে। তখন** তার মনে হয়— আমি তো অনেকগুলো শাস্ত্রের ওপর ব্যাপক **অধ্যয়ন** করেছি। আমার যৌবনের সোনালি মুহূর্তগুলো সেই নানাবিধ **শাস্ত্রের** জ্ঞানচর্চায় কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে— আগামী জীবনে ঠিক কোন বিদ্যা আমার কাজে আসবে? কবরের গহীন অন্ধকারে কোন শাস্ত্র আমাকে সঙ্গ দেবে? এর বিপরীতে কোন জ্ঞান আমার কাজে আসবে না। তাহলে আমার পক্ষে তা বর্জন করা সহজ হবে।

আমার সামনে তো রাসূল **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'আ রয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে মিনতি করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ.

'হে আল্লাহ, আমি তোমার সকাশে সেই বিদ্যা থেকে পানাহ চাই যা আমার উপকারে আসবে না'।

বিষয়টি নিয়ে সে অনেক ক্ষণ ভাবল। অবশেষে কাগজ কলম হাতে নিয়ে শায়খ হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ গাযালী [মহান আল্লাহর অপার রহমতে তিনি সিক্ত হোন]-এর কাছে পত্র লিখলো। পত্রে সে তার অবস্থা জানিয়ে সমাধান কামনা করল। চিঠিতে সে আরো কিছু প্রশ্ন সংযুক্ত করেছিল। চিঠির শেষাংশে সে তাঁর কাছে হিতোপদেশ ও দু'আ কামনা করে।

সে তার পত্রে এ কথাও লিখেছিলো যে, যদিও *ইয়াহইয়াউল উলূম*-সহ এ জাতীয় অন্যসব গ্রন্থে আমার সমস্যাগুলোর নীতিগত জবাব রয়েছে। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম, যেন মহামান্য শায়খ আমার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অল্পকয়েক পৃষ্ঠার ভেতর লিখে দেন। আল্লাহ চাহেন তো, আমি সারাজীবন সেগুলো আমার সঙ্গী করে রাখবো; মৃত্যু পর্যন্ত আমি নিষ্ঠার সঙ্গে তার ওপর আমল করতে সচেষ্ট হবো।

তার সেই উত্তরে হযরত গাযালী রহ. এ পুস্তিকাটি লেখেন। বস্তুত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহর।

***

হে প্রিয় বৎস,

মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের কল্যাণে তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। তিনি তোমাকে তাঁর প্রিয়জনদের পথে পরিচালিত করুন।

খুব ভালোভাবে জেনে নাও— উপদেশের প্রজ্ঞাপন সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় রিসালাতের উৎসমুখ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। যদি তাঁর কাছ থেকে তোমার কাছে নসীহত পৌঁছে থাকে তাহলে কীসের প্রয়োজনে আমার কাছ থেকে নসীহত চাইছো? আর যদি তোমার কাছে তাঁর নসীহত না পৌঁছে থাকে তাহলে এই বিগত বছরগুলোতে তুমি কোন জিনিসটা অর্জন করেছো?!

হে বৎস,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে উদ্দেশ করে যেই অমূল্য নসীহতমালা পেশ করেছেন; তার একটিতে তিনি বলেছেন—

عَلَامَةُ إِعْرَاضِ اللّٰهِ عَنْ الْعَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِيْهِ وَإِنَّ امْرَأً لَوْ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لَجَدِيرٌ أَنْ تَطُوْلَ حَسْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ.

'কোনো বান্দা যদি অর্থহীন কাজ নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে এটি প্রমাণ করেছে যে, তার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির জীবনের যৎসামান্য মুহূর্তও যদি এমন কাজে চলে যায়, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়নি তাহলে নির্ঘাত এটি একদিন তার জন্যে অনেক বড় অনুতাপের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তির বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অথচ এখনো তার ভালো তার মন্দের ওপর প্রাধান্য পায়নি, সে যেন জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত থাকে'।

আমি মনে করি, জ্ঞানীদের জন্যে এ একটি নসীহতই যথেষ্ট।

হে বৎস,

নসীহত করা সহজ; কিন্তু তা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা যারা প্রবৃত্তির অনুগমন করতে অভ্যস্থ, তাদের রসনায় এ নসীহত খুবই তিক্ত মনে হয়। কারণ, তাদের মনের কাছে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। বিশেষ করে, যারা দুনিয়ার পদ-পদবি আর নিজেকে আলাদা করে প্রদর্শনের নিয়তে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন করেছে। তার ওপর এ ধারণা চেপে বসে থাকে যে, 'শুধু ইলম দিয়েই সে পরকালে মুক্তি পেয়ে যাবে। এটাই তার নাজাতের চাবিকাঠি। তার আর আমল করার প্রয়োজন নেই'। অথচ এটি খোদাহারা দর্শনপ্রসূত ভ্রান্ত বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ এর থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তার এই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই যে, সে যখন ইলম অর্জনই করল, আর তার ওপর আমল না করল না তাহলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডের প্রমাণ আরো শক্তিশালী হয়ে গেল। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَشَدُّ النَّاس عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ عَالِمٌ لَم يَنفَعهُ عِلمُه.

'কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে ওই আলেমকে, যার ইলম তার কাজে আসেনি'।

বর্ণিত আছে— জনৈক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ইনতিকালের পর তাকে স্বপ্নে দেখলো। স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞেস করলো— 'হে আবুল কাসেম! তোমার খবর কী'?

উত্তরে জুনাইদ বাগদাদী রহ. বলেন—

طَاحَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَنِيَتْ تِلْـكَ الْإِشَـارَاتُ، وَمَـا نَفَعَنَـا إِلاَّ رُكَيْعَاتٌ رَكَعْنَاهَا فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

'কিতাবের সবগুলো লাইন উড়ে গেছে। সেখানকার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলো হারিয়ে গেছে। একমাত্র সেই কয়েক রাকাত নামায কাজে এসেছে; যা আমি মাঝরাতে আদায় করেছিলাম'।

হে বৎস,

তুমি আমলশূন্য হয়ো না। খোদার প্রেমে নিমজ্জিত ও রিক্তহস্ত হয়ো না। এ বিশ্বাস নিজের ভেতর গেথে নাও যে, নিরেট ইলম বিপদের সময় তোমার কাজে আসবে না। তোমার পাশে থাকবে না।

এর উদাহরণ হল, এক ব্যক্তি খোলা প্রান্তরে আছে। তার হাতে দশটিরও বেশি খুবই মানসম্পন্ন ধারালো তরবারি আছে। এছাড়াও আরো অনেক অস্ত্র আছে। লোকটি যেমন বীর, তেমনি আবার সমরবিদ্যায় পারদর্শী। হঠাৎ তার ওপর একটি বিশাল ভয়ালদর্শন সিংহ হামলে পড়ল। এখন তোমার কী মনে হয়? লোকটি যদি তার অস্ত্রগুলো ব্যবহার না করে, সেগুলো দিয়ে সিংহের ওপর আক্রমণ না করে তাহলে এই নিষ্ক্রিয় অস্ত্রগুলো কি তার কাজে আসবে?!

জানা কথা, এগুলো চালনা না করা হলে, এগুলো দিয়ে আঘাত না করা হলে, তা কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি এক কোটি ইলমী মাসআলা পড়ে, সেগুলো মনোযোগের

সঙ্গে অধ্যয়ন করে আর তার ওপর আমল না করে তাহলে এই আমল না করার কারণে সেগুলো তার কোনো কাজেই আসবে না।

আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। যদি কোনো ব্যক্তির জ্বর হয়, পাশাপাশি তার পিত্তথলিতে কোনো রোগ হয় তাহলে অবশ্যই তাকে চিকিৎসার জন্যে মধু আর সিরকার মিশ্রণে তৈরি সাকাঞ্জাবীন ও কাশকাব অষুধ ব্যবহার করতে হবে। এগুলো সেবন করা ছাড়া তার রোগমুক্তির আশা করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তদ্রূপ মুক্তির জন্যে আমল ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

হে বৎস,

তুমি যদি একশ' বছরও ইলম পাঠ করে যাও। তোমার মণিকোঠায় হাজারো কিতাব সংচয়ন করো, আর তুমি তার ওপর আমল না করো, তাহলে এই কিতাবি বিদ্যার কারণে তুমি আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ○

'ব্যক্তি যতটুকু চেষ্টা করেছে, তার বাইরে আর কিছুই পাবে না'। [সূরা নাজম : ৩৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

'আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন সৎকাজ করে। [সূরা কাহাফ : ১১০]

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

'এটি বিনিময় ওই জিনিসের, যা তারা উপার্জন করে'। [সূরা তাওবা : ৮২]

অপর একটি স্থানে ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তাস্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস রয়েছে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এর পরিবর্তে তারা অন্য কিছু কামনা করবে না'। [সূরা কাহাফ : ১০৭-১০৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেন—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

তবে রক্ষা পাবে তারা, যারা তাওবা করে ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে। [সূরা ফুরকান : ৭০]

তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এই হাদীস সম্পর্কে কী বলবে, যেখানে তিনি ইরশাদ করেন—

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

'পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলাম গড়ে ওঠেছে। প্রথমত এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। দ্বিতীয়ত নামায কায়েম করা। তৃতীয়ত, যাকাত প্রদান করা। চতুর্থত

রমযান মাসে রোযা পালন করা। আর পঞ্চম বিষয় হল, হজ করা যদি তার সামর্থ রাখে।

তুকি কি জানো 'ঈমান' কাকে বলে? ঈমানের সংজ্ঞা হলো— মুখের মাধ্যমে স্বীকার করা, অন্তর থেকে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে আমল করা।

এভাবে আমলের প্রয়োজনীয়তার ওপর অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যাবে। যদিও একজন বান্দা জান্নাতে পৌঁছুবে একমাত্র আল্লাহরই দয়া ও ইহসানের বদৌলতে; কিন্তু সেই দয়া পাওয়ার যোগ্য সে তখনই হবে, যখন তাঁর আনুগত্য ও উপাসনা করবে। কেননা আল্লাহর রহমত একমাত্র ভালো কাজকারীদেরই নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

যদি কেউ আপত্তি করে বলে— আমরা তো জেনে এসেছি যে, একমাত্র ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ জান্নাতে পৌঁছুতে পারে।

আমি বলবো— হ্যাঁ, কিন্তু কখন সে ওইখানে পৌঁছে? মাঝখানে কত দুর্গম বিপদসংকুল গিরিপথ রয়েছে, যা তার পৌঁছার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে? এই গিরিপথগুলোর মধ্য হতে সর্বপ্রথম তাকে ঈমানের গিরিপথে পৌঁছুতে হবে। সেই ঈমান তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় কি-না, এ আশঙ্কা থেকে কি সে নিরাপদ? ঈমানহারা হয়ে সে কি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে?

হযরত হাসান বিসরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার বান্দাদের লক্ষ্য করে বলবেন— 'হে আমার বান্দারা, তোমরা আমার রহমতের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর তোমাদের আমলের পরিমাপ অনুযায়ী সেই জান্নাত নিজেদের মধ্যে ভাগ-বটোয়ারা করো।'

হে বৎস,

পৃথিবীর নিয়ই হল— তুমি যদি কাজ না করো তাহলে কোনো বিনিময় পাবে না। তোমাকে একটি শ্রুত ঘটনা শোনাচ্ছি। বনী ইসরাঈলের

জনৈক ব্যক্তি একনাগাড়ে ৭০ বছর আল্লাহর ইবাদত করল। তখন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলেন— তাকে ফিরিশতাদের সামনে উদ্ভাসিত করবেন। সেমতে আল্লাহ তার কাছে একজন ফিরিশতা পাঠালেন। বললেন— তার কাছে গিয়ে জানাবে যে, 'সে যে এতো ইবাদত করেছে। তারপরও সে এগুলোর মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়নি'।

ফিরিশতা যখন তার কাছে সেই বার্তা পৌছে দিল। তখন সেই আবিদ বলল— 'আমরা তো ইবাদত করতেই সৃষ্ট হয়েছি। কাজেই আমাদের করণীয় হল, আমরা তোমার ইবাদত করতেই থাকবো'।

ফিরিশতা ফিরে এলো। আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে বললো— 'হে আমার মা'বূদ! আপনি তো ভালো করেই জানেন, আপনার বান্দা কী বলেছে'?

আল্লাহ তাআলা বললেন— 'সে যখন আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না, তখন আমি এতো মাহাত্ম্যের অধিকারী হয়ে তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

حاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا.

'তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব-নিকাস করে ফেলো, তোমাদের কাছ থেকে হিসেব নেয়ার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলো নিজেরাই পরিমাপ করে ফেলো, তোমাদের কাছ থেকে পরিমাপ চাওয়ার পূর্বেই'।

আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদিনা হযরত আলী রাযি. বলেন— 'যে ব্যক্তি এ কথা ভেবে বসে আছে যে, সে কোনো ধরনের চেষ্টা ছাড়াই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, সে আশার ঠুনকো দড়ি ধরে ঝুলছে। আর যে মনে করে

যে, সে তার চেষ্টা ব্যয় করে পৌঁছবে, তার আর কোনো কিছুর দরকার নেই'।

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাসান রহ. বলেন, 'আমল না করে জান্নাত চাওয়াও এক প্রকার গুনাহ'।

তিনি আরো বলেন, 'আমল ছেড়ে দেওয়া নয়; বরং আমলের ওপর নির্ভরতা ছেড়ে দেওয়াই বাস্তববাদিতার পরিচয়'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

الْكَيِّسُ : مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ : مَنِ اتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

'প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্যে আমল সঞ্চয় করেছে। আর নির্বোধ হল সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে নিজের প্রবৃত্তির অনুগামী করেছে এবং আল্লাহর কাছে অলিক আশা করে বসে আছে'।

হে বৎস,

কত রাত তুমি জ্ঞানচর্চা আর কিতাবাদির অধ্যয়নে বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছো! এ সময় তুমি নিজের ওপর নিদ্রাকে হারাম বানিয়ে নিয়েছিলে। আমি জানি না, কোন নিয়তে উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি এসব করেছো?

যদি তোমার নিয়ত হয়ে থাকে— তুমি তা দিয়ে দুনিয়ার সম্পদ কামাবে; তার তুচ্ছ বস্তুগুলো কুড়াবে; তোমার সমবয়সী আর সমস্তরের লোকদের ওপর গর্ববোধ করবে তাহলে তোমাকে আমি ধিক্কার জানাই। তোমার জন্যে আফসোস! এর বিপরীতে যদি তোমার ইচ্ছে হয়— এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে; তোমার

নৈতিকতা পরিমার্জিত করবে; অসৎ প্ররোচনা দানকারী প্রবৃত্তিকে দমন করবে তাহলে তোমার জন্যে আশীর্বাদ, তোমার জন্যে শুভ সংবাদ। কবির কবিতায় একটি সত্য কথা ফুটে উঠেছে—

سَهْرُ الْعُيُوْنِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ   وَبُكَـاؤُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلٌ.

বিফলে গেছে সেই নির্ঘুম রাত,   যা তোমার তরে হয়নি
সেই আঁখিজল, বৃথা ক্রন্দন   তোমার বিরহে যা ঝরেনি।

হে বৎস,

তুমি তুমি যেভাবে ইচ্ছে জীবন যাপন করো। তবে মনে রেখো— ক'দিন বাদে তোমাকে মরতেই হবে। যাকে ইচ্ছে ভালবেসে যাও। তবে মনে রেখো— তাকে তোমার ছাড়তেই হবে। আর যা ইচ্ছে আমল করো। তবে মনে রেখো— তোমাকে সেই আমলের বিনিময় নিতেই হবে।

হে বৎস,

এই যুক্তিবিদ্যা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, কাব্যচর্চা, নক্ষত্র বিদ্যা, ছন্দ ও অন্তঃমিল শাস্ত্র, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্র— এই বিদ্যাগুলো যদি তোমাকে তোমার মহান প্রভুর দুয়ারে এনে দাঁড় না করায় তাহলে এগুলো অর্জন করে তোমার কী লাভ! এগুলো তো সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সলাতু ওয়াসসালামের ইনযিল শরীফে একটি চমৎকার কথা পড়েছি। তিনি বলেন—

مِنْ سَـاعَةِ أَنْ يُوْضَـعَ الْمَيِّـتُ عَلَى الْجَنَـازَةِ إِلَى أَنْ يُوْضَـعَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ يَسْأَلُ اللهُ بِعَظْمَتِـهِ مِنْـهُ أَرْبَعِـيْنَ سُـؤَالاً، لله أَوَّلُهُ يَقُوْلُ : عَبْدِيْ طَهرْتَ مَنْظَرَ الْخَلقِ سِنِيْنَ وَمَا طَهَّرْتَ مَنْظَرِيْ

سَاعَةً، وَكُلَّ يَوْمٍ ينظرُ فِيْ قَلْبِكَ يَقُوْلُ : مَا تصْنَعُ لِغَيْرِيْ وَأَنْتَ مَحْفُوْفٌ بِخَيْرِيْ، أَمَا أَنْتَ أَصَمُّ لاَ تَسْمَعُ؟

'মৃত ব্যক্তিকে যখন কফিনে রাখা হয়, তখন থেকে নিয়ে কবরের পাদদেশে রাখার পূর্ব পর্যন্ত— এই মধ্যবর্তী সময়ে মহান আল্লাহ তাঁর বড়ত্বের বলে তাকে চল্লিশটি প্রশ্ন করে থাকেন। আল্লাহ শপথ! প্রথমে তিনি তাকে এই প্রশ্ন করেন— হে আমার বান্দা, তুমি বছরের পর বছর তোমার বাইরের আকৃতি সুন্দর করতে খেটেছো। কিন্তু আমার দৃশ্য সুন্দর করতে তুমি এক মুহূর্তও খাটোনি। প্রতিদিন সে তোমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলেছে— তুমি আমার কল্যাণ দিয়ে বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেনো পরের জন্যে কাজ করে যাচ্ছো? তুমি কি বধির হয়ে গিয়েছিলে? কেনো তুমি সেই কথা শোনোনি?

হে বৎস,

আমলশূন্য ইলম পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ইলম ছাড়া আমল কখনই গ্রহণযোগ্য হয় না।

তুমি জেনে রাখো— এই আমলশূন্য ইলম আজ তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর উঠিয়ে দেবে না। এই ইলম তোমাকে আগামীকাল জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা করবে না। যদি তুমি আজ আমল না করো, তুমি যদি তোমার অতীতের দিনগুলোর ক্ষতিসমূহ পুষিয়ে না নাও তাহলে কাল কিয়ামতের দিন তুমি অবশ্যই একথা বলবে— আমাদের দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎ আমল করে আসি। তখন তোমাদের মুখের ওপর বলে দেয়া হবে— ওহে নির্বোধ! তুমি তো সেখান থেকেই এসেছো। [অর্থাৎ পূর্বে কেনো সৎ আমল করে রাখোনি?]

হে বৎস,

তুমি তোমার প্রাণের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করো। তোমার প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করো। তোমার দেহকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করো। কেননা তোমার সর্বশেষ গন্তব্য তো সেই কবর। কবরবাসীগণ প্রতিটি মুহূর্তে তোমার অপেক্ষা করছে যে, কখন তুমি তাদের সঙ্গে মিলিত হবে? খবরদার! তুমি পাথেয় ছাড়া তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না।

হযরত আবূ বকর রাযি. বলেন— এই দেহগুলো হয় পাখির খাঁচা আর নয়তো ঘোড়ার আস্তাবল। এখন তুমি তোমার নিজেকে নিয়ে ভাবো যে, তুমি তার কোনটি? যদি তুমি উর্ধ্বের পাখি হয়ে থাকো তাহলে যখন তুমি ঢোলের ঝঙ্কারে اِرْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ [ফিরে এসো তোমার প্রভুর কাছে] এর আহ্বান শোনতে পাবে, তখন উড়ে গিয়ে বিভিন্ন জান্নাতের বড় বড় গম্বুজগুলোর মাথায় গিয়ে বসবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

'সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুর কারণে পরম করুণাময়ের আরশ কেঁপে ওঠেছে'।

আর আল্লাহ মাফ করুন! যদি তুমি চতুষ্পদ জন্তু হয়ে থাকো যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

ওরাতো গবাদিপশুর মতো; বরং আরো অধিক নিকৃষ্ট।

তাহলে নির্ঘাত ধরে নিয়ো, তোমাকে তোমার আস্তাবলের কোণ থেকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে ছুড়ে ফেলা হবে।

কথিত আছে, একবার হযরত হাসান বিসরী রহ.-কে ঠাণ্ডা পানির শরবত পরিবেশন করা হয়। তিনি সেই পেয়ালা হাতে নেয়ামাত্রই অজ্ঞান হয়ে

যান এবং সেটি তার হাত থেকে পড়ে যায়। পরে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তার কাছে জানতে চাওয়া হয়— হযরত! কী হয়েছিলো আপনার? তিনি বলেন, আমার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। জাহান্নামীরা জান্নাতের অধিবাসীদের কাছে প্রত্যাশা করে বলবে—

اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

'আল্লাহ তোমাদেরকে যেই রিযিক দিয়েছেন সেখান থেকে অথবা কিছু পানি আমাদের ওপর ফেলো'।

হে বৎস,

যদি শুধু আমলই তোমার জন্যে যথেষ্ট হতো আর তার বাইরে আমলের প্রয়োজন না থাকতো তাহলে আল্লাহ তাআলার এই ডাকগুলোর কী অর্থ 'আছো কি কোনো প্রার্থনাকারী?' 'আছো কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী?' 'আছো কি কোনো তাওবাকারী?'। এগুলোর তো তখন কোনো অর্থ থাকে না।

বর্ণিত আছে— একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কয়েক জন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. প্রসঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। তখন নবীজি বলেন—

نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ!

ও তো বেশ ভালো ছেলে। তবে যদি রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তো!

বর্ণিত আছে— একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জনৈক সাহাবীকে বলেন—

يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدَعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ও অমুক! ... রাতে বেশি ঘুমিয়ো না। কেননা যে ব্যক্তি রাতে বেশি ঘুমোবে, তাকে তার এই ঘুম কিয়ামতের দিন নিঃস্ব বানিয়ে ছাড়বে।

হে বৎস,

তুমি নিম্নের তিনটি আয়াত সাজিয়ে দেখো। দেখবে, প্রথম আয়াতে আল্লাহ আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে শুকরিয়ার দৃশ্য দেখিয়েছেন এবং তৃতীয় আয়াতে তাদের প্রশংসা করে আলোচনা করেছেন।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ

আর রাতের একাংশে তাহাজ্জুদ পড়ো। [ইসরা : ৭৯]

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾

আর তারা শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে। [যারিয়াত : ১৮]

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

আর যারা রাতের শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। [আলে ইমরান : ১৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

ثَلاَثَةُ أَصْوَاتٍ يُحِبُّهَا اللهُ صَوْتُ الدِّيْكَةِ وَصَوْتُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالأَسْحَارِ.

আল্লাহ তাআলা তিন ধরনের শব্দ ভালবাসেন। প্রথমটি হলো— মোরগের ডাক। দ্বিতীয়টি হলো— কুরআন কারীম তিলাওয়াতকারীর শব্দ। আর তৃতীয়টি হলো— শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের কণ্ঠস্বর।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা রাতের শেষাংশে একটি বাতাস সৃষ্টি করেন। যা মহাক্ষমতাধর রাজাধিরাজের কাছে যিকির ও ইসতিগফার বহন করে নিয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন— যখন রাতের প্রথম প্রহর চলে আসে তখন আরশের নিচ থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে— হুশিয়ার! ইবাদতকারী বান্দারা জেগে ওঠো। তখন তারা জেগে ওঠেন এবং নামায পড়েন, আল্লাহ যতোটুকু চান।

এরপর রাতের মধ্যভাগে ঘোষক এসে পুনরায় ঘোষণা করে— হুশিয়ার! অনুগত বান্দারা জেগে ওঠো। তখন তারা ঘুম ভেঙে উঠে যান এবং ভোর পর্যন্ত নামায পড়েন।

যখন শেষ রাত ঘনিয়ে আসে, তখন ঘোষণাকারী করে ঘোষণা করে, হুশিয়ার! ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরা জেগে ওঠো। তখন তারা জেগে ওঠেন এবং ইসতিগফার করেন। এরপর যখন ফজর উদিত হয়ে যায় তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়, ওরে গাফেলের দল! জেগে ওঠ। তখন তারা বিছানা ছেড়ে এমনভাবে ওঠে, যেভাবে কবর থেকে মৃতলাশ তোলা হয়।

হে বৎস,

বর্ণিত আছে— হযরত লুকমান হাকীম রহ. তাঁর ছেলেকে এই উপদেশও দিয়েছিলেন— হে আমার বৎস! কোনোভাবে যেন মোরগ তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান না হয়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, মোরগ ভোরে ডাকছে আর তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছো।

সাধুবাদ সেই কবিকে, যিনি নিম্নের চরণগুলো লিখেছেন—

لَقَدْ هَتَفَتْ فِيْ جُنْحِ لَيْلٍ   حَمَامَةٌ عَلٰى فَنَنٍ وَهْنًا وَإِنِّيْ لَنَائِمٌ

كَذَبْتُ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتُ   عَاشِقًا لَمَا سَبَقَتْنِيْ بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمُ

وَأَزْعَمُ أَنِّيْ هَائِمٌ ذُوْ صَبَابَةٍ   لِرَبِّيْ فَلَا أَبْكِيْ وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ.

আঁধার রাতের নিরবতা ভেঙে গাছের ডালে বসে একটি পায়রা তার ভাঙা কণ্ঠে ডেকে ওঠেছে; অথচ তখনও আমি গভীর নিদ্রায় বিভোর।

শপথ করে বলছি— তখন উপলব্ধি হলো, আমি মিথ্যুক। যদি আমি সত্যিই আশেক হতাম তাহলে আমার আগে একটি পায়রা প্রেমাষ্পদের জন্যে কাঁদতে পারতো না।

অথচ আমি মনে করছি— আমি আমার প্রভুর প্রেমে মত্ত আশেক। এটি কিভাবে সত্য হয়, আমার চোখে তখনও আঁসু নেই, যখন একটি তুচ্ছ প্রাণীও অশ্রুসিক্ত।

হে বৎস,

সব ইলমের সারকথা হলো— তোমাকে জানতে হবে, আল্লাহর আনুগত্য ও তার ইবাদত কাকে বলে?

জেনে রাখো— আনুগত্য ও ইবাদত হলো, কথা ও কাজের মাধ্যমে করণীয় ও বর্জনীয় উভয়টার ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসরণ করা । অর্থাৎ তুমি যা বলবে, তুমি যা করবে এবং তুমি যা ছাড়বে, তার সবকিছুই শরীয়তমাফিক হতে হবে। যেমন, তুমি যদি ঈদের দিনে বা আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখো তাহলে তুমি গুনাহগার হবে। তুমি যদি লুণ্ঠিত কাপড় পড়ে নামায পড়ো তাহলে তুমি যতো বড় আবিদের বেশ-ভূষা ধরো না কেনো; তোমাকে অবশ্যই পাপী বল্য হবে।

হে বৎস,

তোমার করণীয় হলো, তোমার কথা ও কাজ যেন শরীয়তমাফিক হয়। কেননা যেই ইলম ও আমলের মাঝে শরীয়তের অনুসরণ নেই সেটি গুমরাহি ছাড়া কিছু নয়। তবে তোমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তুমি যেন সূফিয়ানা অতিরঞ্জন ও নিষ্ফলা বাড়াবাড়ির ফাঁদে না পড়ো।

কেননা আধ্যাত্ম সাধনার এই পথে চলতে হলে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আত্মিক কামনা দমন করতে হবে আর দুষ্ট প্রবৃত্তিকে হত্যা করতে হবে। এরই নাম আত্মশুদ্ধি। সাধুসূলভ রং মেখে ঢং সাজা আর ছেন্না বস্ত্র পরিধান করার নামই আধ্যাত্ম সাধনা নয়।

জেনে রেখো— লাগামহীন মুখ আর প্রবৃত্তিপূজা ও গাফলতিতে টইটুম্বর অন্ধকার মন হলো দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে নিখাদ সাধনা দিয়ে দমন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মন মারিফাতের আলোয় সমুজ্জ্বল হবে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো— তোমার আর্জির মাঝে এমন কিছু প্রশ্ন আছে, লিখে বা বলে যার যথার্থ উত্তর দেয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সেই হালতে না পৌঁছুবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বুঝবে না— সেটি কী? অন্য কোনো ভাবে তা উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। কেননা এটির সম্পর্ক সুস্থ রুচিবোধের সঙ্গে। আর রুচি বা স্বাদের বিষয় কখনো বিবরণ বলে ফুটিয়ে তোলা যায় না। যেমন, মিষ্টান্নের মিষ্টি স্বাদ, তিতা ফলের তিক্ততা একমাত্র জিহ্বা দিয়ে আস্বাদন করেই অনুভব করা যায়। কাগজে লিখে বা মুখে বলে নয়। একটি ঘটনা বলছি। একবার এক নপুংষক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর কাছে পত্র লিখে জিজ্ঞেস করলো যে, আমাকে বুঝাও তো, যৌনসঙ্গমের অনুভূতি কেমন হয়?

তখন সে বন্ধু তার উত্তরে পত্রে লিখে যে, হে অমুক! আমি তোমাকে এতোদিন শুধু নপুংসকই জানতাম। এখন দেখছি তুমি যেমন নপুংসক, তেমন নির্বোধও। এই অনুভূতির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনশক্তির সঙ্গে। যখন তুমি সেখানে পৌঁছুবে, তখন তুমি অনুভব করতে পারবে। মুখে বলে বা কাগজে লিখে তার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

হে বৎস,

তোমার কয়েকটি প্রশ্ন অনেকটা সেই রকম। আর কিছু প্রশ্ন এমনও আছে, যা উত্তর দিয়ে বলে বুঝানো যাবে। সেই উত্তরগুলো আমি

'ইয়াহইয়াউ উলূমিদ দ্বীন' ও অন্যান্য রচনায় জানিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি সংক্ষেপে খানিকটা আলোকপাত করবো ও ইশারায় বুঝিয়ে যাবো। কাজেই আমার কথাগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনবে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্ম সাধনার পথে চলতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই চারটি কাজ করতে হবে—

প্রথম কাজ হলো— নিজের বিশ্বাস শতভাগ শুদ্ধ করতে হবে এমনভাবে যে, সেখানো কোনো বিদআত থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয় কাজ হলো— খাটি মনে তাওবা করতে হবে এমনভাবে যে, এরপর সেই ভুল আর করা যাবে না।

তৃতীয় কাজ হলো— বিবাদমান পক্ষগুলোকে সন্তুষ্ট করে ফেলতে হবে এমনভাবে যে, তোমার ওপর কারো কোনো অধিকার থাকতে পারবে না।

আর চতুর্থ কাজ হলো— শরীয়তের ইলম অর্জন করতে হবে এ পরিমাণ যে, এর দ্বারা তুমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলি যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে। এরপর তোমাকে অন্যান্য ইলম এ পরিমাণ অর্জন করতে হবে, যা তোমার মুক্তির পথে সহায়ক হবে।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, হযরত শিবলী রহ. চার শ' জন শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করেছেন। তাদের সেবা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, 'আমি চার লক্ষ হাদীস পড়েছি। সেখান থেকে একটি মাত্র হাদীস বেছে নিয়েছি। আর তার ওপর আমল করে যাচ্ছি। বাকিগুলো থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছি। কেননা আমি গভীর পর্যবেক্ষণ ও অন্তস্পর্শী চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর মাঝেই আমার সকল সমস্যার সমাধান ও কাঙ্ক্ষিত মুক্তি রয়েছে। আমি দেখেছি, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সমস্ত জ্ঞান এই একটি হাদীসের মাঝেই নিহিত রয়েছে। সে হাদীসটি হলো, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক সাহাবীকে উপদেশ জানিয়ে বলেন—

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مُقَامِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا.

'তুমি তোমার দুনিয়ার জন্যে সে পরিমাণ কাজ করো, যে পরিমাণ সময় তুমি সেখানে থাকবে। আর তোমার আখিরাতের জন্যে সে পরিমাণ আমল করো, যে পরিমাণ সময় তোমাকে সেখানে থাকতে হবে। আর আল্লাহর জন্যে সেই পরিমাণ আমল করো, যে পরিমাণ তার কাছে তোমার প্রয়োজন রয়েছে। আর জাহান্নামের আগুনের জন্যে সেই পরিমাণ আমল করো, তা সহ্য করার যে পরিমাণ শক্তি তোমার রয়েছে।

হে বৎস,

তুমি যদি এ হাদীসটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারো তাহলে তোমার ঢের জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই।

আরেকটি ঘটনা তোমাকে বলছি। ঘটনাটি খুব ভালোভাবে নিরীক্ষণ করবে। তা হলো, প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাতেম আসম রহ. ছিলেন আরেক বুযুর্গ হযরত শাকীক বাল্‌খী রহ.-এর শিষ্য। একদিন হযরত বালখী রহ. তাঁর প্রিয় শাগরেদ হাতেম রহ.-কে জিজ্ঞেস করেন—, 'তুমি দীর্ঘ তেত্রিশটি বছর আমার কাছে শিক্ষার্জন করেছ। এই দীর্ঘ সময়ে তুমি কী অর্জন করলে?'

হযরত আসেম রহ. বললেন, আমি ইলমের এই বিশাল ভুবন থেকে আটটি উপকারিতা অর্জন করেছি। তবে আমার মনে হয়েছে, এগুলো আমার জন্যে যথেষ্ট হবে। কেননা এগুলোর মাঝে আমি আমার নাজাত ও মুক্তির চাবিকাঠি পেয়েছি।

হযরত শাকীক রহ. জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী?

হযরত হাতেম বললেন—

এক. আমি আল্লাহর সৃষ্টিজীবগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তখন লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি রয়েছে; যাকে সে ভালবাসে এবং যার প্রেমে সে বিভোর থাকে। এই প্রিয় জিনিসগুলোর কোনোটি মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। কোনোটি কবরের পাদদেশ পর্যন্ত সঙ্গ দেয়। এরপর সব প্রিয়রাই ফিরে যায়। সে একাকী নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে। তাদের কেউই তার সঙ্গে তার কবরে প্রবেশ করে না। তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম, একজন ব্যক্তির জন্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস সেটাই, যা তাকে তার কবরেও সঙ্গ দেবে। সেখানেও সে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশবে। আমি খুব খোঁজাখুঁজির পর একমাত্র সৎ আমলকেই পেলাম, যা কবরের নিঃসঙ্গ মুহূর্তেও ব্যক্তিকে ছেড়ে যায় না। কাজেই তাকেই আমি আমার প্রিয় বানিয়ে নিলাম। যেন সে আমার জন্যে কবরের অন্ধকারে বাতি হয়, সেখানে আমার অন্তরঙ্গ হয় এবং আমাকে একা ছেড়ে চলে না যায়।

দুই. আমি কমবেশ সবাইকে দেখতে পেলাম যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। তাদের মনের ইচ্ছেগুলো পূরণ করার জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। তখন আমি একটি আয়াত খুব গভীরভাবে ভেবে দেখলাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

'আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজের আত্মাকে প্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল'। [সূরা নাযি'আত : ৪০-৪১]

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে, একমাত্র কুরআনই সত্য ও বাস্তববাদী। কাজেই তার হিদায়াত মেনে আমি এখন আমার আত্মার বিরোধিতায়

ছুটছি। তার দমনে কোমর বেঁধে লড়ছি। তাকে কখনই প্রবৃত্তির কাছে ভেড়ার সুযোগ দিচ্ছি না। এখন সে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তার কাছে সম্পূর্ণ নত হয়ে গেছে।

তিন. আমি সমস্ত লোককে লক্ষ্য করেছি যে, তারা দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুগুলো সঞ্চয় করতে প্রাণান্ত খেটে বেড়াচ্ছে। সেগুলোকে সে হাতের মুঠোয় দখলে রাখার জন্যে বজ্রমুষ্ঠি করে রেখেছে। তখন আমি আল্লাহর এই কথা গভীরভাবে ভেবে দেখলাম—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

'তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা রয়ে যাবে। [সূরা নাহল : ৯৬]

তখন আমি আমার কাছে দুনিয়ার যা কিছু অর্জিত ছিলো, তার সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করলাম। সেগুলো গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম। যেন সেগুলো আল্লাহর কাছে আমার নামে সঞ্চিত থাকে।

চার. আমি দুনিয়াবাসীকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তারা কোন জিনিস অর্জন করতে পারাকে নিজেদের সম্মান ও গৌরব মনে করে? তখন দেখলাম যাতে তাদের একদল গোত্র ও বংশের জনবলের প্রাচুর্য্যকে তাদের গৌরব মনে করে। তারা এ নিয়েই বড়াই করে।

অপর দলকে দেখলাম, তারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করা, তাদের ওপর জোর-জুলুম করা এবং তাদের রক্ত প্রবাহিত করাতেই গর্ব ও সম্মান অনুভব করে।

আরেকদলকে পেলাম, যারা সম্পদ অপচয় করা, অপব্যয় করা, স্রোতের মতো ভাসিয়ে দেওয়াকেই গৌরবের কাজ মনে করে। তখন আমি আল্লাহর একটি আয়াতের ওপর গভীর মনোযোগ দিলাম—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ط

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্য হতে ওই ব্যক্তিই বেশি সম্মানিত, যে তাঁকে অধিক ভয় করে'। সূরা [হুজুরাত : ১৩]

তখন থেকে আমি তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দিলাম এবং এই দৃঢ়বিশ্বাস মনের মধ্যে গেথে নিলাম— কুরআন যা বলে, তাই সত্য এবং তাই বাস্তব। আর অন্যরা যা ধারণা করছে, তার সবগুলোই মিথ্যা ও অবান্তর।

পাঁচ. আমি লক্ষ্য করলাম— লোকেরা একে অন্যের সমালোচনা করে। তাদের একদল অপরদলের গীবত করে বেড়ায়। তখন আমি এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখলাম— সম্পদ, সম্মান ও জ্ঞানের হিংসা-প্রতিহিংসাই এর একমাত্র কারণ ও উৎস। তখন আমি আল্লাহর এই বাণীকে গভীরভাবে ভেবে দেখলাম—

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'আমি পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি'। [সূরা যুখরুফ : ৩২]

তখন আমি বুঝলাম— আল্লাহ তাআলা যা দেয়ার, অনাদিকালেই বণ্টন করে দিয়েছেন। এরপর থেকে আমি আর কাউকে হিংসে করি না। আল্লাহ আমার ভাগ্যে যতটুকু বণ্টন করে দিয়েছেন, তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকি।

ছয়. আমি লোকদেরকে লক্ষ্য করলাম, তারা বিভিন্ন স্বার্থে ও কারণে পরস্পরে শত্রুতা করে। তখন আমি আল্লাহর এই আয়াতের ওপর গভীর মনোনিবেশ করলাম—

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই তাকেই তোমরা শত্রুরূপে গ্রহণ করো। [সূরা ফাতির : ৬]

তখন থেকে আমি বুঝে নিলাম, এক শয়তান ছাড়া আর কারো সঙ্গে শত্রুতা করা ঠিক হবে না।

সাত. আমি দেখলাম— দুনিয়ার প্রত্যেকেই তার জীবিকা উপার্জন করার জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস করছে। তারা এর জন্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা কোনটা হারাম আর কোনটা সন্দেহজনক; তার কোনো বাছ-বিচারই করে না। নিজেকে ছোট করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অবলীলায় নিজের মান-সম্মান গুটিয়ে হীন জায়গাতেও নেমে পড়ে। তখন আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর গভীরে লক্ষ্য করলাম—

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

পৃথিবীর বুকে যতো প্রাণী রয়েছে, তাদের সবার রিযিক আল্লাহর ওপর। [সূরা হুদ : ৬]

তখন আমি বুঝে নিলাম— আমার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর। তিনি এর দায়িত্বভার নিয়ে রেখেছেন। কাজেই আমি নিজেকে তার ইবাদতে নিমগ্ন করে নিয়েছি। তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে আমার কামনা গুটিয়ে নিয়েছি।

আট. আমি লক্ষ্য করেছি, দুনিয়ার সবাই কোনো না কোনো সৃষ্টবস্তুর প্রতি নির্ভর করে আছে। কেউ টাকা-পয়সার ওপর নির্ভর করে আছে। কেউ অর্থ-সম্পদ আর রাজত্বের ওপর নির্ভর করে আছে। কেউ তার পেশা ও শিল্পের ওপর নির্ভর করে আছে। কেউ তার মতো আরেক সৃষ্টিজীবের ওপর নির্ভর করে আছে। তখন আমি আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ওপর লক্ষ্য করলাম—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করেন। নিশ্চয়ই

তিনি প্রতিটি বস্তুর জন্যে একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে রেখেছেন'। [সূরা তালাক : ৩]

তখন থেকে আমি আল্লাহর ওপর এতটাই নির্ভর হয়ে গেছি যে, তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কার্যসম্পাদক।

তখন হযরত শাকীক রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাওফীক দান করুন। আমি তাওরাত, যবূর, ইনযিল ও কুরআন কারীম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি দেখতে পেয়েছি— ওই চার গ্রন্থ এই আটটি উপকারিতা কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোর ওপর আমল করবে, সে এই চার কিতাবের ওপর আমলকারী হয়ে যাবে।

হে বৎস,

তুমি এই দু'টি ঘটনা থেকে জানতে পারলে যে, তোমার জন্যে খুব বেশি ইলম অর্জন করার দরকার নেই। এখন আমি তোমাকে জানাবো যে, সালেক (আধ্যাত্ম্য পথের অনুসন্ধানী পথিক)-এর জন্যে কী করণীয়?

জেনে রেখো, সালেক'র জন্যে সর্বপ্রথম করণীয় হলো, তাকে একজন পরিচালনাকারী তত্ত্বাবধানকারী শায়খের হাতে হাত রাখতে হবে। যেই শায়খ তরবিয়ত (দীক্ষা) দিয়ে তার থেকে মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করবেন এবং সেগুলোর স্থানে উত্তম শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

তরবিয়তের অর্থ অনেকটা ওই কৃষকের কাজের মতো, যে তার শষ্যক্ষেত থেকে বিভিন্ন কাঁটা ও আগাছা তুলে বাইরে ফেলে দেয়। যেন তার শষ্য খুব ভালো করে গজিয়ে ওঠতে পারে, ফলন খুব ভালো হয়। কাজেই আধ্যাত্ম পথের পথিকের জন্যে এমন একজন শায়খ প্রয়োজন; যিনি তাকে প্রশিক্ষণ দেবেন। তাকে আল্লাহ তাআলার পথের নির্দেশনা দেবেন। এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ যুগে যুগে পথহারা উম্মাহকে পথ দেখাতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যখন সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দায়িত্ব পালন করে পরপারে চলে গেছেন, এখন তাঁর

সুযোগ্য খলীফাগণ তাঁর স্থানে অভিষিক্ত হয়েছেন; যেন তারা পথদেখানোর সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

শায়খ যে কেউ হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ করতে হয়। একজন শায়খকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় সব যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই আলেম হতে হবে। তবে সব আলেমই যে শায়খ হতে পারবেন, ব্যাপারটি এমন নয়। আমি তোমাকে একজন কামেল শায়খের পরিচয় সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছি; যেন যে কেউ এসে মুরশিদ হওয়ার দাবি করতে না পারে। একজন শায়খের পরিচয় হলো—

১. তাকে অবশ্যই দুনিয়া ও মান-সম্মানের লোভ থেকে বিমুখ হতে হবে।

২. তাকে এমন কোনো প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অনুসারী হতে হবে, যিনি তৃতীয় কোনো প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অনুসারী। এভাবে তাদের অনুসরণের ধারাবাহিকতা নবীকূল সর্দার হযরত মুহাম্মাদ মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছুবে।

৩. তাকে অবশ্যই খাওয়া, কথা ও ঘুমের স্বল্পতা আর নামায, দান ও রোযার আধিক্যের মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমন করার সাধনা সূচারুরূপে সম্পন্নকারী হতে হবে।

৪. তাকে অবশ্যই সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত শায়খের আনুগত্যের মাধ্যমে উন্নত চারিত্রিক শিষ্টাচারগুলোকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গ বানিয়ে নিতে হবে। উন্নত চারিত্রিক শিষ্টাচারের অর্থ হলো, তাঁর মাঝে ধৈর্য্য, নামায, শোকর, আল্লাহনির্ভরতা, দৃঢ় ঈমান, অল্পেতুষ্টি, আত্মিক প্রশান্তি, দূরদর্শিতা, বিনয়, গভীর জ্ঞান, সততা, শালীনতা, অঙ্গিকার পূরণ, গাম্ভীর্য্য, সুস্থিরতা ও এ জাতীয় অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর সন্নিবেশ থাকতে হবে।

তখনই সেই ব্যক্তি হয়ে ওঠবে নববী আলোয় দীপ্ত আলোর মিনার। তিনি তখন হয়ে উঠবেন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যদিও এ জাতীয় আলোর বাতিঘরের সংখ্যা খুবই কম। তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি মহাসৌভাগ্য বলে এমন কোনো শায়খের দেখা পায় তাহলে তার প্রথম কর্তব্যই হলো— তাকে নিজের শায়খের স্থানে অধিষ্ঠিত করে নেওয়া, তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে শ্রদ্ধা করা।

বাহ্যিক শ্রদ্ধা বলতে উদ্দেশ্য হলো— কখনই তার সঙ্গে বিবাদ করবে না; তার সঙ্গে প্রতিটি মাসআলাতে দলিল দেখাতে যাবে না; যদিও সে জানে যে, তিনি এক্ষেত্রে ভুলের ওপর আছেন। তার উপস্থিতিতে একমাত্র নামায আদায়ের সময় ছাড়া অন্য সময় জায়নামায পাতবে না। নামায শেষ করেই সেই জায়নামায উঠিয়ে ফেলবে। তিনি থাকাকালে বেশি নফল নামায পড়বে না। শায়খ যা নির্দেশ করবেন, তা যথাসাধ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে।

আর আত্মিক শ্রদ্ধা হলো, শায়খের কাছ থেকে যে কথাগুলো শুনেছো ও বাহ্যিকভাবে গ্রহণও করেছো সেগুলোকে ভেতর থেকে অস্বীকার করবে না। নয়তো মুনাফেকি হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, ভেতর বাইরকে মেনে নিতে পারছে না তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ভেতর ও বাইর এক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শায়খের সংশ্রব এড়িয়ে চলবে। দ্বিতীয়ত মন্দ লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসা পরিহার করবে; যেন মনের আঙিনা থেকে দুষ্ঠ মানব ও দানবের কর্তৃত্ব উঠে যায়। তবেই সে মন শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে ওঠবে। আর সর্বাবস্থায় ধনাঢ্যতার ওপর দারিদ্র প্রাধান্য দেবে।

এরপর জেনে নাও, তাসাওউফ হলো দু'টি বৈশিষ্ট্যের নাম। প্রথমটি হলো— ইসতিকামাত (সরলতা ও অবিচলতা)। আর দ্বিতীয়টি হলো— সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করা। কাজেই সে ব্যক্তি ইসতিকামাতের মাধ্যমে

সৎ হলো ও সততার ওপর অবিচল হলো আর মানুষের সঙ্গে তার আচরণকে সুন্দর করলো ও তাদের সঙ্গে প্রজ্ঞাময় ব্যবহার করলো, সত্যিকার অর্থে সে-ই 'সূফি'।

ইসতিকামাত হলো— ব্যক্তি তার আত্মার অংশকে তার আত্মার জন্যেই উৎসর্গ করবে।

আর মানুষের সঙ্গে সদাচরণের অর্থ হলো— তোমার নিজের মনের ইচ্ছের ওপর তাদেরকে উঠিয়ে আনবে না; বরং তোমার নিজেকে তাদের ইচ্ছের ওপর উঠিয়ে নেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরীয়তের বাইরে যাবে না।

এরপর তুমি আমাকে আল্লাহর দাসত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো। আল্লাহর দাসত্ব হলো তিন জিনিসের নাম।

এক. শরীয়তের নির্দেশনা হিফাযত করা।

দুই. আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদীরের বণ্টনের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা।

তিন. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে গিয়ে নিজের আত্মার সন্তুষ্টি ছেড়ে দেওয়া।

আর তুমি আমার কাছে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। দেখো, তাওয়াক্কুল হলো, আল্লাহ তাআলার কৃত অঙ্গিকারগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাস প্রচণ্ড দৃঢ় রাখা। অর্থাৎ তুমি এই বিশ্বাস লালন করবে যে, তোমার ভাগ্যে যা রয়েছে, তা অবশ্যই তোমার কাছে আসবে। যদি পৃথিবীর সবাই মিলে তা তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে নির্ঘাত তারা ব্যর্থ হবে। আর যা তোমার ভাগ্যে লেখা নেই তা পৃথিবীর সকলের প্রাণান্ত প্রয়াসেও তোমার কাছে পৌঁছুবে না।

তুমি আমাকে ইখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো। ইখলাস হলো, তোমার সমস্ত কাজকর্ম যেন আল্লাহয় সমর্পিত হয়। মানুষের প্রশংসায় যেন

তোমার মন আত্মপ্রসাদ লাভ না করে। আবার তাদের সমালোচনায় যেন সে কষ্ট না পায়।

জেনে রেখো, এই রিয়া বা লোকপ্রদর্শনের মনোভাব তখন সৃষ্টি হয় যখন মনের ভেতর মানুষের বড়ত্ব জেগে ওঠে। আর এর চিকিৎসা হলো, যখন তুমি তাদেরকে আল্লাহর কুদরতের অধীনে নিতান্তই বাধ্যগত মনে করবে; ভাববে, এরা উদ্ভিৎ জগতের মতো শক্তিহীন। এরা তোমাকে যেমন কিছু দেয়ার যোগ্যতা রাখে না, তদ্রূপ তোমার কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়ারও শক্তি রাখে না। তাহলে দেখবে, তাদেরকে প্রদর্শনের মনোভাব তোমার থেকে দূর হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যখন তুমি তাদেরকে শক্তিশালী মনে করবে; তাদেরকে তাদের ইচ্ছেশক্তি বাস্তবায়নের সক্ষমতার অধিকারী ভাববে, তখন তোমার মন থেকে তাদেরকে প্রদর্শন করার মনোভাব দূর হবে না।

হে বৎস,

তোমার চিঠিতে এমন বেশ কিছু প্রশ্ন আছে, আমার বিভিন্ন রচনাবলিতে যার উত্তর জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই সেগুলোকে সেখান থেকে জেনে নাও। আর তুমি এমন কিছু প্রশ্ন করেছো, যার উত্তর লেখা হারাম। তোমার কর্তব্য হলো, তুমি যতটুকু জেনেছো, সেই অনুযায়ী আমল করতে থাকো। যেন এর কল্যাণে অজানা বিষয়ের ইলম আবিষ্কৃত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের ওপর আমল করবে, মহান আল্লাহ তাকে তার অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন।

হে বৎস,

আজ থেকে যা কিছু তোমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে তা সম্পর্কে আমার কাছে কেবল মনের ভাষাতেই প্রশ্ন করবে। অন্য কোনো ভাষাতে নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

'আর যদি তারা বিষয়টি তাদের কাছে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য্যের পরিচয় দিতো তাহলে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো'। [সূরা হুজুরাত : ৫]

তুমি হযরত খিযির আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামের নসীহত গ্রহণ করো, যখন তিনি বলেছেন—

فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

'এখন থেকে তুমি আমাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না, যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে তা সম্পর্কে অবহিত করি'। [সূরা কাহাফ : ৭০]

কাজেই এখন থেকে তুমি সেই পর্যন্ত না পৌছে বা তোমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না।

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝

'শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাবো। কাজেই তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়ো করো না। [সূরা আম্বিয়া : ৩৭]

সুতরাং তুমি আমাকে সময় না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করবে না। পাশাপাশি তুমি এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, পথে বের না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়গুলো ছুতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا

'তারা কেনো জমিনের বুকে সফর করে না, তবে তারা দেখতে পেতো...।' [সূরা রূম : ৯]

হে বৎস,

আল্লাহর শপথ! যদি তুমি আল্লাহর জমিনে সফর করো তাহলে প্রতিটি মনযিলে তুমি বিরল বিরল জিনিস দেখতে পাবে। আর অবশ্যই তোমাকে তোমার রূহ ব্যয় করতে হবে। কেননা এই কাজের মূলই হলো রূহ ব্যয় করা। যেমনটি হযরত যুন-নুন মিসরী রহ. তার জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'যদি তুমি রূহ ব্যয় করার সক্ষমতা রাখো তাহলে এসো। নয়তো সুফিদের রং-ঢং নকল করে কোনো লাভ নেই'।

হে বৎস,

আমি তোমাকে আটটি উপদেশ দিচ্ছি। এগুলো তুমি মনে-প্রাণে গ্রহণ করো। নয়তো এগুলো কিয়ামতের দিন তোমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে চারটির ওপর তুমি আমল করবে আর চারটিকে বর্জন করবে। যে চারটি তোমাকে বর্জন করতে হবে সেগুলো হলো,

প্রথম বর্জনীয় বিষয় হলো, কোনো মাসআলাতে তুমি পারতপক্ষে কারো সঙ্গে বিতর্কে জড়াবে না। কেননা এর মাঝে অনেক আপদ রয়েছে। আর এতে যে লাভ হয়, তার তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। উপরন্তু এটি অনেকগুলো নিন্দনীয় অভ্যাশ জন্ম দেয়। যেমন, লোকপ্রদর্শন, হিংসা, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, বৈরীতা, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে তোমার কোনো মাসআলা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়, আর সেক্ষেত্রে সত্য প্রতিষ্ঠা করা বা সত্যকে জলাঞ্জলী হতে না দেয়া তোমার লক্ষ্য হয়, তখন তার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে পারো। কিন্তু এটিই যে তোমার লক্ষ্য, তা প্রমাণিত করতে দু'টি আলামত লাগবে।

প্রথমটি হলো, সত্য তোমার মুখ দিয়ে বের হোক বা অন্যের মুখ দিয়ে বের হোক; কোনো ফারাক পড়তে পারবে না। (অর্থাৎ উভয় অবস্থায় সত্য মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে)।

আর দ্বিতীয়টি হলো, জনসম্মুখে সেই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে নিভৃতে অনুষ্ঠিত হওয়াই তোমার কাছে প্রিয় হতে হবে।

এখন শোনো— আমি তোমাকে একটি অতীব দরকারী কথা বলছি। তা হলো— কোনো সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চিকিৎসকের কাছে নিজের রোগ ব্যক্ত করার নামান্তর। আর তার উত্তর দেয়াটি হলো, চিকিৎসকের পক্ষ থেকে রোগ দূর করার প্রয়াসী পদক্ষেপ।

এখন যারা জাহেল, তারা হলো অন্তরের রোগে আক্রান্ত। আর যারা আলেম তারা হলেন তাদের চিকিৎসক।

চিকিৎসক যেমন দুই প্রকার। দক্ষ চিকিৎসক আর হাতুড়ে ডাক্তার, তেমনি আলেমদের মাঝেও দু'টি শ্রেণি রয়েছে। অর্ধআলেম আর পূর্ণ আলেম। যে ব্যক্তি অর্ধআলেম, সে এই মনের ব্যাধির চিকিৎসা ভালোভাবে করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যিনি পূর্ণ আলেম, তিনিও সব রোগের চিকিৎসা করতে যাবেন না। তিনি একমাত্র তার চিকিৎসা করতে যাবেন, যিনি তার পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মানতে প্রস্তুত। যেমন কোনো রোগ যদি এমনভাবে অনিরাময়যোগ্য হয় যে, অষুধ দিলেও যাবে না, সেক্ষেত্রে যিনি প্রাজ্ঞ চিকিৎসক, তার কথা একটাই হয়, এই রোগ সারবে না। কাজেই তার চিকিৎসা করে কোনো লাভ নেই। এতে বরং সময়ের অপচয় হবে।

এখন তোমাকে জানতে হবে যে, অজ্ঞতার ব্যাধি চার প্রকার। এর মধ্য হতে একটিমাত্র প্রকার নিরাময়যোগ্য। আর বাকি তিনটির কোনোটাই নিরাময়যোগ্য নয়।

অজ্ঞতা ব্যাধির যেই তিন প্রকার সারে না, সেগুলো হলো—

এক. যার প্রশ্ন ও আপত্তি হিংসা ও বৈরীতা থেকে জন্ম নিয়েছে। তাকে তুমি যতো সুন্দর, সামগ্রিক, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাবই দাও না কেনো;

তার প্রশ্ন কমবে না, বরং তার বৈরীতা, হিংসা ও বিদ্বেষ বাড়তেই থাকবে। কাজেই তার ক্ষেত্রে একটাই করণীয়। তা হলো, তার প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করবে না। কবি বলেছেন—

كُلُّ الْعَدَاوَةِ تُرْجَى إِزَالَتُهَا إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدِ.

সব বৈরীতা আশা করা যায়
হবে একদিন নিঃশেষ,
তবে নিভবে না হিংসা থেকে
জন্মেছে যেই দ্বেষ।

কাজেই তোমার জন্যে উচিৎ হলে—তুমি তার থেকে মুখ গুটিয়ে নাও। তাকে তার রোগ নিয়েই থাকতে দাও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۥعَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

> কাজেই আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন তাথেকে; যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে এবং একমাত্র পার্থিব দুনিয়ারই প্রত্যাশা করে। [সূরা নাজম : ২৯]

আর সবসময় হিংসুক ব্যক্তি তার নিজের কথা ও কাজ দিয়ে তার নিজের জ্ঞানের ক্ষেতেই আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

إِنَّ اَلْحَسَدَ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ.

> 'হিংসা সেভাবে পুণ্যকাজগুলো খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে'।

দুই. যার প্রশ্ন করার কারণ হলো তার নির্বুদ্ধিতা। এই ব্যক্তির মনের অজ্ঞতার রোগও সারবে না। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, 'আমি মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হইনি। কিন্তু কখনো নির্বোধের চিকিৎসা করতে সক্ষম হইনি'।

এই দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই ব্যক্তি, যে খুব বেশি দিন ইলম অর্জন করেনি এবং শরীয়ত ও যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তার জ্ঞান নিতান্তই কম। এখন সে তার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বড় আলেমের কাছে গিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে। অথচ সে আলেম ব্যক্তি তাঁর জীবনের বৃহৎ একটি অংশ ইলম সাধনায় কাটিয়ে এসেছেন। ফলশ্রুতিতে তার কাছে যেমন শরয়ী জ্ঞান রয়েছে তেমনি রয়েছে যুক্তিবিদ্যা। অথচ এই মুর্খ নির্বোধ মনে করে যে, তার কাছে যেই বিষয়টি অস্পষ্ট, তা সেই আলেমের কাছেও অস্পষ্ট। কাজেই সে যখন ওই বিদ্যানের বিদ্যার গভীরতা জানে না, কাজেই তার প্রশ্নও হবে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। এ জাতীয় প্রশ্নও এড়িয়ে চলাই সঙ্গত।

তিন. এমন লোক যিনি সত্যিকার অর্থেই সত্যসন্ধানী। এখন পূর্ববর্তী মনীষীদের কিছু কথা তার না বুঝার কারণ হলো, তার উপলব্ধি ক্ষমতা কম। এখন যদিও সে সত্য জানার আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন করেছে; কিন্তু বাস্তবতা হলো, উপলব্ধির স্বল্পতার কারণে সে বিষয়টির মৌলিকত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। কাজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়াও ঠিক হবে না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ.

‘আল্লাহ তাআলার আমাদের আম্বিয়ায়ে কেরামের জামাতকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, আমরা যেন লোকদের সঙ্গে তাদের মেধার দৌড় অনুপাতে কথা বলি’।

চার. অজ্ঞতা নামক ব্যধির যে প্রকারটি নিরাময়যোগ্য, সেটি হলো, প্রশ্নকারী সত্যিকার অর্থে সত্য জানার অভিপ্রায় নিয়েই প্রশ্ন করেছে। পাশাপাশি লোকটি বুদ্ধিমান ও উপলব্ধিসম্পন্ন। উপরন্তু হিংসা, ক্রোধ, প্রবৃত্তিপূজা আর সম্মান ও প্রাচূর্যের মোহেও মত্ত নয়। আদ্যোপান্ত সে সরল পথের অনুসন্ধানী। তার সেই প্রশ্নটি কোনো হিংসা বা একগুয়েমি কিংবা পরীক্ষা করার ইচ্ছে থেকে প্রসূত নয়। এ লোকের আন্তরিক প্রশ্ন

অবশ্যই উত্তর পাওয়ার অধিকার রাখে। কাজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কেবল জায়েযই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিবও বটে।

দ্বিতীয় বর্জনীয় বিষয় হলো, তুমি তোমার নিজেকে কখনই ওয়াযকারী আর নসীহতকারী হতে দেবে না। কেননা এতে আপদের শেষ নেই। তুমি যা বলবে, তার ওপর সর্বপ্রথম নিজেকে আমলকারী বানাবে। এটি করতে পারলে অন্যকে উপদেশ দিতে যেয়ো। নয়তো নয়। হযরত ঈসা আলাইহিস-সলাতু ওয়াস-সালামকে যে কথাটি বলা হয়েছিলো, তা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখো। সেটি হলো—

يَا ابْنَ مَرْيَمَ عِظْ نَفْسَكَ، فَإِنْ اتَّعَظَتْ فَعِظِ النَّاسَ، وَإِلاَّ فَاسْتَحِ مِنْ رَبِّكَ.

'হে মরয়াম-তনয়! তুমি যখন নসীহত করবে, তখন প্রথম তোমার নিজেকে নসীহত করবে। যদি সে তোমার নসীহত মানে তাহলে অন্যকে নসীহত করো। নয়তো তোমার খোদা থেকে লজ্জাবোধ করো'।

যদি তুমি এ রোগের রোগী হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে অবশ্যই দু'টি অভ্যাস পরিহার করতে হবে,

প্রথম অভ্যাস. তুমি কথা বলার সময় অবশ্যই কৃত্রিমতা পরিহার করে চলবে। অনেকে কথা বলার সময় কারো কোনো কথার উদ্ধৃতি টেনে বা সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করে বা সূফিয়ানা ঢং মেখে কিংবা কবিতা বা ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে থাকে। এগুলো অবশ্যই এড়িয়ে চলবে। কেননা আল্লাহ তাআলা কৃত্রিমতাকারীদের ঘৃণা করেন। আর কোনো ব্যক্তির মাত্রাছাড়ানো কৃত্রিমতা অবলম্বন করাটা তার মনের অস্বচ্ছতা ও চরম গাফলতির পরিচয়।

'তাযকীর' বা 'অন্যের জন্যে ওয়ায করা'-র অর্থ হলো, এক ব্যক্তি এসে জাহান্নাম নিয়ে ওয়ায করছে। এখন সে প্রথমে বলবে, মহান স্রষ্টা

আল্লাহর যথাযথ বন্দেগি করতে ত্রুটি রয়ে গেছে। পেছনের জীবন নিয়ে ভাবিয়ে দেবে যে, সেখানে কত যে অর্থহীন কাজে সময় কেটেছে! এখন আগামীর দিনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা উস্কে দেবে যে, আগামী জীবনে কতগুলো যে ঘাটি রয়েছে! শেষ পর্যন্ত ঈমান নিরাপদ থাকে, কি থাকে না? সেই ভাবনা পেয়ে বসবে। মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো দিতে পারবে, কি পারবে না? তার ভাবনায় ডুবে যাবে।

এরপর কিয়ামতের দিন নিজের অবস্থা নিয়ে সন্দিহান হবে। সেদিন কি ভালোভাবে সীরাতে মুস্তাকীম পার হতে পারবে, না বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামে পড়বে?

এভাবে একটির পর একটি ভাবনার ঝড় হৃদয় তছনছ করতে থাকবে। অস্থির হয়ে পড়বে।

এ পদ্ধতিতে ওয়ায করে মনের ভেতর আগুনের পর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া আর বিভিন্ন বিপদ-আপদের দিকে মনের স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়াকেই 'অন্যের জন্যে ওয়ায' বলা হয়। জনতার মনে এ বিষয়গুলো আলোড়িত করা, তাদেরকে তাদের দোষ-ত্রুটির ওপর সতর্ক করা, তাদের চোখে তাদের বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে দেওয়া; এই কাজগুলো এজন্যে করা হয় যেন আসর জমে ওঠে। মজলিসের আগুন জ্বালিয়ে তপ্ত করতেই সেই মুসিবতগুলোকে উদ্বেলিত করে দেয়া হয়। যেন প্রত্যেকে তাদের স্মৃতিশক্তির সামর্থ অনুপাতে বিগত জীবনের হালখাতা নিয়ে বসে। তারা যেন যেই সময়গুলো আল্লাহর অবাধ্যতায় কেটে গেছে, তা নিয়ে অনুশোচনা করতে বসে।

মোটকথা, এই পদ্ধতিতে কথা বলাকে ওয়ায করা বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ব্যক্তির বাড়ির দিকে প্লাবন ধেয়ে আসে আর ঐ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সেই বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে তখন তুমি কী বলবে? নিশ্চয়ই তুমি এতটুকুই বলবে, সতর্ক হও! সতর্ক হও! প্লাবন থেকে ভাগো। এধরনের পরিস্থিতিতে কি তুমি ঢং করে শব্দ ও

বাক্যের কৃত্রিম ছন্দ বানিয়ে, বিভিন্ন সাহিত্যালঙ্কার আর ছন্দময় পংক্তি ব্যবহার করে, কথার ভেতর সূক্ষ্মতা ও হেয়ালি সৃষ্টি করে তাকে প্লাবনের সংবাদ দেবে? তোমার মন কি এ কাজ করতে সায় দেবে? কখনই নয়। ওই (পেশাদার) ওয়াযকারীরও একই অবস্থা। কাজেই এমন করা আদৌ উচিৎ হবে না।

দ্বিতীয় অভ্যাস. তোমার ওয়ায করার সময় কখনো যেন এই চেতনা তোমাকে তাড়িয়ে না বেড়ায় যে, মানুষ তোমার ওয়ায মাহফিলে দলে দলে ছুটে আসবে; এখানে এসে তার মাওলার ইশকের ভাবাবেগে উদ্বেলিত হবে; কাপড় ছিড়বে। ফলে তোমার সম্পর্কে বলাবলি হবে— তার মাহফিল কতই না চমৎকার! কেননা এই জাতীয় চিন্তাই তোমার নিজেরই দুনিয়ার প্রতি প্রবল আসক্ত হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহর প্রতি উদাসীনতা থেকেই এগুলো সৃষ্টি হয়। বরং ওয়ায করার সময় তোমার চেতনা ও করণীয় হলো, তুমি লোকদেরকে ডাকবে দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে; গুনাহ থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে; দুনিয়া-লোলুপতা ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দিকে; কার্পণ্য থেকে দানশীলতার প্রতি; আত্মবিভোরতা ছেড়ে খোদাভীরুতার দিকে। তাদের কাছে পরকাল প্রিয় করে তুলবে; দুনিয়ার প্রতি তাদেরকে অনাসক্ত বানাবে; তাদেরকে ইবাদত ও পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি শিক্ষা দেবে; কেননা আজকালকের মানুষের মন-মগজ আর ধ্যান-ধারণায় শরীয়তবিরোধিতা ছেয়ে আছে। তারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না- এমন কাজ করতেই বেশি পটিয়সী। বাজে অভ্যাসের প্রতি তাদের মনের ঝোঁক তীব্র। কাজেই তাদের মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলো। আগামী জীবন সম্পর্কে তাদের মনে ভয় ছড়িয়ে দাও। হতে পারে, এতে তাদের ভেতরের অবকাঠামো বদলে যাবে; তাদের বাইরের লেনদেনে পরিবর্তন আসবে; গুনাহ ছুড়ে ফেলে আল্লাহর আনুগত্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর আকুতি প্রকাশ পাবে। এটাই হলো ওয়ায ও নসীহতের যথার্থ

তরিকা। যে ওয়ায এমন হবে না; সেই ওয়ায যে করবে আর যে শুনবে তাদের ওপর ধিক! শত ধিক! এমন ওয়াযকারী নির্ঘাত শয়তানের এজেন্ডা নিয়ে পথে নেমেছে। সে তাদেরকে ন্যায্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে নেমেছে। একদিন সে তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কাজেই এ ধরনের বক্তাদের এড়িয়ে চলা জনগণের দায়িত্ব। কেননা সে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কারণ সে নিজেই শয়তানের ক্রীড়ানক। যদি কারো শক্তি ও সামর্থ্য থাকে তাহলে সে যেন তাকে ওয়াযের মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। কেননা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের আওতায় এ ধরনের কাজও অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় বর্জনীয় বিষয় হলো, রাজন্যবর্গ ও আমির-উমরার সঙ্গে মিশবে না। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবেও না। কেননা তাদের দিকে তাকানো, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা এবং তাদের সংশ্রবে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। তারপরও যদি কোনো কারণে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ো তাহলে কোনোভাবে তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করবে না। কেননা যখন কোনো ফাসেক বা জালেমের গুণগান করা হয় তখন আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বিত হন। যে ব্যক্তি তাদের জন্যে দীর্ঘ হায়াতের দুআ করবে সে পক্ষান্তরে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত থাকার পক্ষে রায় দিচ্ছে।

চতুর্থ বর্জনীয় বিষয় হলো, আমির-উমারা ও রাজন্যবর্গের দেওয়া কোনো দান বা উপহার গ্রহণ করবে না। যদিও তুমি জানো যে, তারা তা তাদের হালাল সম্পদ থেকে দিচ্ছে। কেননা তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুর লোভ করাটা ঈমান ধ্বংস করে দেয়। কারণ হলো, এখেকে চাটুকরিতা, তাদের পক্ষাবলম্বন ও তাদের অনাচারের প্রতি সমর্থন জন্ম নেবে। আর এগুলোর সবক'টিই দ্বীনদারিত্ব ধ্বংস করে দেয়। ন্যূনতম এই ক্ষতি তোমার হবেই যে, যখন তুমি তাদের উপহার গ্রহণ করবে এবং

তাদের দুনিয়া থেকে লাভ ভোগ করবে, তখন তাদের প্রতি সদ্ভাব ও প্রীতি জন্মাবে। আর দুনিয়ার নিয়ম হলো, মানুষ যেই জিনিস পসন্দ করে সে অবশ্যই সেই জিনিসের দীর্ঘায়ু কামনা করে, তার অস্তিত্বের নিরবিচ্ছিন্নতা চায়। আর একজন জালেমের বেঁচে থাকা কামনা করার অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দাদের ওপর তার জুলুম বাকি থাকার কামনা করা, দুনিয়ার বরবাদি কামনা করা। তাহলে বলো— একজন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করার জন্যে এরচে' বড় আর কী প্রয়োজন?

সাবধান! খুবই সাবধান! এক্ষেত্রে তোমার জন্যে শয়তানের অনেক বড় একটি ফাঁদ অপেক্ষা করবে। কিছু লোক এসে তোমাকে ফুঁসলাবে যে, তোমার জন্যে উত্তম হলো— তুমি তাদের দেয়া টাকা-পয়সা নিয়ে নেবে আর সেগুলো গরিব-মিসকেনদের মাঝে বণ্টন করে নেবে। যদি তুমি তা না করো তাহলে সে অর্থই তারা গুনাহ ও পাপাচারের কাজে ব্যয় করবে। কাজেই এধরনের খাতে তাদের তা ব্যয় করার চেয়ে দুর্বল লোকদের মাঝে তোমার ব্যয় করাটা ঢের উত্তম।

সাবধান! তাদের এ ধরনের কথায় কখনো বিভ্রান্ত হবে না। অভিশপ্ত শয়তান এই কুমন্ত্রণা দিয়ে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরও মাথা কেটে দিয়েছে। আমি 'ইয়াহইয়াউ-উলূমিদ-দীন'-এর মাঝে এর ওপর সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানেই তা দেখে নিয়ো।

যে চারটির ওপর তোমাকে আমল করতে হবে, তা হলো—

এক. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তোমার কাজ-কর্ম ও লেনদেন এমন হতে হবে যে, তোমার কোনো গোলাম যদি তোমার সঙ্গে তেমন কাজ-কর্ম ও লেনদেন করত তাহলে তার সেই কাজের ওপর সন্তুষ্টি হয়ে যেতে, তার প্রতি তোমার মনে কোনো ক্ষোভ থাকতো না বা তুমি সংকীর্ণতা বোধও করতে না। আরে! একজন কৃত্রিম গোলামের যেই কাজ তোমার মনের কাছে সন্তোষজনক হবে না, সে কাজ তুমি তোমার সত্যিকারের মনিবের ক্ষেত্রে অবশ্যই মেনে নিতে পারো না।

দুই. তুমি যখন মানুষের জন্যে কাজ করবে, তখন ঠিক সেভাবেই কাজ করবে, তোমার নিজের জন্যে হলে এ কাজটি যেভাবে করতে পসন্দ করতে। কেননা একজন বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না সে সবার জন্যে তাই ভালবাসবে, যা তার নিজের জন্যে ভালবাসে।

তিন. যখন তুমি কোনো শাস্ত্র পড়বে বা অধ্যয়ন করবে, তখন উচিৎ হলো, তোমার এই ইলম যেন তোমার মন সংশোধন করে; তোমার নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ করে। এর উদাহরণ হলো, ধরে নাও তুমি কোনোভাবে জেনে গেছো যে, তুমি এক সপ্তাহের বেশি বাঁচবে না। তাহলে নির্ঘাত তুমি এ সময় ফেকাহ, নৈতিকতা, মূলনীতি, যুক্তিবিদ্যা— এধরনের শাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে না। কেননা তুমি ভালোকরেই জানো— এ ইলমগুলো তোমার কাজে আসবে না। বরং তুমি নিশ্চয়ই এ সময় চরম ব্যস্ততার সঙ্গে তোমার মন নিয়ে ধ্যান করবে, তোমার আত্মার গুণগুলো চিনে নেবে, দুনিয়ার সমস্ত বন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে ফেলবে, নিজের আত্মাকে সমস্ত মন্দ অভ্যাশ থেকে পরিষ্কার করে ফেলবে, আল্লাহর ভালবাসা ও তার ইবাদতে নিমগ্ন হয়ে ডুবে যাবে, ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তুলবে। একজন বান্দার প্রতিটি দিন আর প্রতিটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিৎ যে, সে ধরে নেবে— এখুনি তার মরে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

হে বৎস,

আমার কাছ থেকে তুমি অন্য একটি কথা শোনো। কথাটির ওপর গভীর মনোযোগ দিয়ো। হতে পারে এতেই তুমি তোমার মুক্তি পেয়ে যেতে পারো। যদি তোমাকে কোনো ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয় যে, এক সপ্তাহ পর বাদশাহ তোমাকে দেখতে আসবেন তাহলে তুমি কী করবে? নিশ্চয়ই

তুমি প্রথমে সন্ধান করবে যে, বাদশাহ এখানে আসলে কোন কোন জিনিসের ওপর তার দৃষ্টি পড়বে? তুমি নিশ্চয়ই খুঁজে খুঁজে তোমার কাপড়, দেহ, ঘর-বাড়ি, বিছানা-পত্তর; ইত্যাদি সবকিছু ঠিকঠাক করে নেবে!

এখন আমি তোমাকে যে দিকে ইঙ্গিত করলাম, তা নিয়ে তুমি ভাবো। তুমি তো বুদ্ধিমান একজন ছেলে। আর কথাও খুব বেশি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি?

إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত আর কাজ-কর্ম দেখবেন না। তিনি দেখবেন— তোমাদের অন্তর আর তোমাদের কর্মকাণ্ড'।

যদি তুমি মনোজগতের চালচিত্র জানতে চাও তাহলে *ইয়াহইয়াউ-উলূমিদ-দ্বীনসহ* আমার অন্যান্য রচনা দেখো। কারণ হলো, মনোজগতের চালচিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এই বিদ্যাটি জানা প্রত্যেকের ওপর আবশ্যক। ফরযে আইন। পক্ষান্তরে অন্য শাস্ত্রগুলো জানা ফরযে কেফায়া; তাও এতোটুকু, যতোটুকুর মাধ্যমে আল্লাহর ফরযসমূহ আদায় করা যায়। এই বিদ্যাটি নিঃসন্দেহে সেক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

চার. এক বছর চলার জন্যে তোমার যে পরিমাণ দুনিয়াবি সক্ষমতা দরকার, তার বেশি তুমি তোমার কাছে সঞ্চয় করবে না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকজন স্ত্রীদের বেলায় করেছেন। তিনি দু'আ করতেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوتَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের খোরাক যথেষ্ট করে দাও'।

এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয় হলো, এই ব্যবস্থাপনা কিন্তু সকল পুণ্যবতী স্ত্রীদের বেলায় ঘটেনি। একমাত্র তাদের জন্যেই করে রাখতেন, যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন যে, তার মনে খানিকটা দুর্বলতা রয়েছে। নয়তো বাকি যারা শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী ছিলেন, তাদের গৃহে দেড় দিনের বেশি খোরাক মওজুদ রাখতেন না।

হে বৎস,

এই চিঠিতে তোমার চাওয়াগুলো লিখে দেয়া হলো। কাজেই সেগুলোর ওপর আমল করা তোমার কর্তব্য। আর তুমি যখন দু'আ চেয়ে আল্লাহর সকাশে হাত তুলবে, তখন সেখানে আমাকে স্মরণ রাখতে ভুলো না।

তুমি আমার কাছে কিছু দু'আ লিখে দেয়ার আবেদন করেছিলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসগুলো খুঁজে দেখো। সেখানে অনেক উপকারী দুআ রয়েছে। তবে আমি তোমাকে একটি দুআ লিখে দিচ্ছি। যা তুমি তোমার সুবিধেমতো সময় পাঠ করবে। বিশেষত নামায শেষে পাঠ করার চেষ্টা করবে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنَ النِّعْمَةِ تَمَامَهَا وَمِنَ الْعِصْمَةِ دَوَامَهَا، وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوْلَهَا، وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُوْلَهَا، وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ، وَمِنَ الْعُمُرِ أَسْعَدَهُ، وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَتَمَّهُ، وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَعَمَّهُ، وَمِنَ الْفَضْلِ أَعْذَبَهُ، وَمِنَ اللُّطْفِ أَقْرَبَهُ.

اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ أَخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ آجَالَنَا، وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ آمَالَنَا، وَاقْرِنْ بِالْعَافِيَةِ غُدُوَّنَا وَآصَالَنَا، وَاجْعَلْ إِلى رَحْمَتِكَ مَصِيْرَنَا وَمَآلَنَا، وَاصْبُبْ سِجَالَ عَفْوِكَ عَلى ذُنُوْبِنَا، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِإِصْلاَحِ عُيُوْبِنَا، وَاجْعَلِ التَّقْوى زَادَنَا، وَفِيْ دِيْنِكَ اجْتِهَادَنَا، وَعَلَيْكَ تَوَكُّلُنَا وَاعْتِمَادُنَا.

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلٰى نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ، وَأَعِذْنَا فِي الدُّنْيَا مِنْ مُوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَخَفِّفْ عَنَّا ثِقْلَ الْأَوْزَارِ، وَارْزُقْنَا عِيْشَةَ الْأَبْرَارِ، وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْأَشْرَارِ، وَاعْتِقْ رِقَابَنَا، وَرِقَابَ آبَائِنَا، وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا مِنَ النَّارِ، بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ، يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ، يَا عَلِيْمُ يَا جَبَّارُ، يَا اللهُ... يَا اللهُ... يَااللهُ... بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِيْنَ يَا آخِرَ الْآخِرِيْنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ، يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার করজোরে মিনতি করে চাইছি পূর্ণ নি'আমত, স্থায়ী নিষ্কলুষতা, ব্যাপক দয়া, সার্বিক নিরাপত্তা, স্বচ্ছল জীবন, সৌভাগ্যময় হায়াত, অতিপূর্ণ ইহসান, অতিব্যাপক পুরস্কার, সুমিষ্ট অনুগ্রহ, অতি কাছের করুণা।

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পক্ষে হয়ে যাও, আমাদের বিপক্ষে যেয়ো না। 'হে আল্লাহ! তুমি সৌভাগ্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের যবনিকা করো। আমাদের প্রত্যাশাগুলো আরো বাড়িয়ে পূরণ করো। আমাদের সকাল-সন্ধ্যাগুলোকে নিরাপত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ো। তোমার রহমতকে আমাদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিয়ো। আমাদের গুনাহের ওপর তোমার ক্ষমার বারিধারা বর্ষণ করো। আমাদের দোষগুলো সংশোধিত করে আমাদের ওপর দয়া করো। খোদাভীরুতাকে আমাদের পাথেয় বানিয়ে দিয়ো। আমাদের চেষ্টাগুলোকে

তোমার দ্বীনকেন্দ্রিক করে দিয়ো। আমরা একমাত্র তোমার ওপরই নির্ভর করি ও আস্থা রাখি।

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যপথের ওপর অবিচল রেখো। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হতে হবে, এমন সব পদক্ষেপ থেকে দুনিয়াতেই বাঁচিয়ে রেখো। আমাদের ভারি ভারি বোঝাগুলো হালকা করে দিয়ো। আমাদেরকে সৎলোকের জীবন যাপন করতে দিয়ো। দুষ্ট লোকদের অসততা থেকে তুমিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও; সেগুলো আমাদের থেকে তুমি প্রতিহত করে দিয়ো। আমাদেরকে ও আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোনদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। তোমার রহমতের ওসিলা দিয়ে চাচ্ছি হে পরাক্রমশালী! হে সকল অপরাধ মার্জনাকারী! হে করুণাময়! হে পাপ গোপনকারী! হে সর্বজ্ঞানী! হে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী! হে আল্লাহ... হে আল্লাহ... হে আল্লাহ... তোমার রহমতের উসিলায় আমাদের দুআ কবূল করো হে সবচেয়ে বড় দয়াবান! হে অনাদি! হে অনন্ত! হে মহাক্ষমতাধর, পরাক্রমশালী! হে অনাথদের ওপর দয়াকারী! হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! তুমি ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। তুমিই পবিত্র। আমি একজন জালিম।

মহান আল্লাহ আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গ; সবার ওপর দরুদ বর্ষণ করো। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্যে; যিনি দু'জাহানের রব।

تمت